নবমুকুল

আসানসোল গার্লস কলেজের নেচার ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত
বাংলা ই-ম্যাগাজিন

নবমুকুল

আসানসোল গার্লস কলেজের নেচার ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত
বাংলা ই-ম্যাগাজিন

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয়
- উপাধ্যক্ষের কলমে
- নেচার ক্লাব এর কথা

সমাজ ও পরিবেশ

- রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা : প্রসঙ্গ রক্তকরবী -সোনালী ভাণ্ডারী (৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)
- মহাত্মা গান্ধীর পরিবেশভাবনা- বর্ণালী মাজি (৪র্থ সেমিস্টার,ইংরেজি বিভাগ), শম্পা মুন্ডা(৪র্থ সেমিস্টার ,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ),প্রিয়া রায় (৪র্থ সেমিস্টার বাংলা বিভাগ)
- সুন্দরলাল বহুগুণা : এক পরিবেশ প্রেমীর কথা- অঙ্কিতা মহান্ত এবং সীমা মন্ডল (ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ)

পরিবেশ নিবন্ধ

- মিথেনের কথা - ঋতবীণা মিত্র (ষষ্ঠ সেমিস্টার, রসায়ন বিভাগ)
- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথা- ঋত্বিকা কুন্ডু, (৪র্থ সেমিস্টার, প্রায়োগিক গণকযন্ত্র বিভাগ)
- ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন প্রোজেক্ট-এর কথা - ঐস্মিতা ঘোষ, ঈশা দত্ত, গোলাপ মাজি, অষ্টমী গরাই, প্রীতি সেন(ষষ্ঠ সেমিস্টার, গণিত বিভাগ)
- ভূমিকম্পের কথা - মধুরিমা ব্যানার্জী (৬ষ্ঠ সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ)

ছবির পাতা

- মানুষ ও পরিবেশ : অন্তরঙ্গতার কথা -ছবি ও লেখায় : তুহিনা ধীবর (ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ)

কবিতার পাতা

- প্রকৃতি প্রেম- সুদেষ্ণা বকসী (৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)
- প্রকৃতির একরুপতা- সুদেষ্ণা বকসী (৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

খবরের পাতা

- সবুজ রক্ষায় আসানসোল গার্লস কলেজের এন এস এস এর উদ্যোগ - বিশাখা সিংহা (এন এস এস সদস্য)

সম্পাদকীয়

এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বরিষায়

এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে

তপনহীন ঘন তমসায় ..

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের কঠিনতম পরিস্থিতিতে যেখানে বাঙালি তার পরিবেশ ভাবনা নিয়ে সচেতন নয় সেখানে আমরা মনস্থির করেছি , নবীন লেখিকাদের সৃষ্টির আলোকে আলোকিত হোক এই পত্রিকা।আমাদের এইবারের সংখ্যা শুরু হয়েছে , কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা সাংকেতিক নাটক রক্তকরবী যার মানুষের মধ্যে থাকা অসীম লোভ কিভাবে জীবনের স্বাভাবিকতা আর সৌন্দর্য কে দমিয়ে রেখেছে সেকথা আলোচনার মধ্যে দিয়ে। এছাড়া 'মহাত্মা গান্ধীর পরিবেশভাবনা' আর সুন্দরলাল বহুগুনার পরিবেশ ভাবনা বিষয়ক লেখা দুটিও সমাজ ও পরিবেশ এর মধ্যেকার যোগাযোগের ধারাকে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। এর পরবর্তীতে গ্রিনহাউস গ্যাস এবং মিথেন -এর ক্ষতিকারক প্রভাব , ই- বর্জ্য আর সমস্যা নিয়ে লিখেছে আমাদের সহপাঠীরা । আর পাত সঞ্চালন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে আরেকটি নিবন্ধে যা আমাদের সাম্প্রতিক তুরস্ক এর ভুমিকপের হেতু গুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য পত্রিকা প্রকাশের আগের দিনই অর্থাৎ ২১.০৩.২৩ তারিখে দিল্লী শহর কেপে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। এছাড়াও হাইড্রোজেন এর সহায়তা নিয়ে ও যে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় ও দূষণ ও কমানো যায় তা নিয়েও লিখেছে আমাদের সহপাঠী। মানুষের সাথে পরিবেশের যে অন্তঃরঙ্গ সম্পর্ক সেকথা বলা হয়েছে ছবির পাতায় আর প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবিতার পাতায় । এর সাথে রয়েছে এন এস এস এর কথাও। আমাদের নেচার ক্লাবের সম্পর্কেও রয়েছে কিছুকথা। আমরা চেষ্টা করেছি এই পত্রিকাকে সর্বাঙ্গীনভাবে সুন্দর করে তুলতে কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে ভুলত্রুটি অনিবার্য তাই তাই ত্রুটি মার্জনীয়। পাঠকের ইতিবাচক উপদেশ আমরা প্রত্যাশা করছি, যা আমদের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার আগামী সংখ্যাকে আরও সুন্দর করবে । সর্বশেষে আমাদের মাননীয় উপাধ্যক্ষ ড. সন্দীপ কুমার ঘটক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই উদ্যোগ-কে উৎসাহ দান করার জন্যে।

ধন্যবাদসহ

সুদেষ্ণা বকসী এবং সোনালী ভাণ্ডারী

৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ (সাম্মানিক)

২২.০৩.২৩

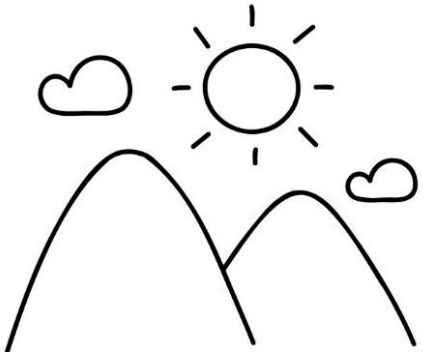

উপাধ্যক্ষের কলমে

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আসানসোল গার্লস কলেজের নেচার ক্লাব-এর উদ্যোগে 'নবমুকুল' শীর্ষক বাংলা ই-ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে।এই ই-ম্যাগাজিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছাত্রীদের অংশগ্রহণ। আশা করা যায় এই ই-ম্যাগাজিনটি পরিবেশ সচেতনতার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

ড. সন্দীপ কুমার ঘটক
উপাধ্যক্ষ
আসানসোল গার্লস কলেজ
২২.০৩.২৩

নেচার ক্লাবের কথা

আসানসোল গার্লস কলেজের নেচার ক্লাব কলেজের উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমোদনক্রমে ৩১.০১.২৩ তারিখে গঠিত হয় দুইজন শিক্ষক-কে { শ্রী উত্তম মান্ডি (সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ) এবং ড.মাল্যবান চট্টোপাধ্যায় (সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ) } প্রাথমিক সদস্য হিসেবে সঙ্গে নিয়ে । পরবর্তী কালে নেচার ক্লাব পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে হিসেবে বাংলা ই- ম্যাগাজিন প্রকাশের কথা ভাবেন যার নাম দেওয়া হয় " নবমুকুল" এবং এক্ষেত্রে ছাত্রীদের থেকে নিবন্ধ চাওয়া হয় নোটিশের মাধ্যমে ০১.০৩.২৩ তারিখে , যাতে বলা হয় লেখকদের সকলকেই নেচার ক্লাবের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। সেই মত এই নবমুকুল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যারা লেখা দিতে পেরেছেন তাঁরাও এই নেচার ক্লাবের সদস্য। আগামী দিনে এর সদস্য যাতে আরও অনেক উৎসাহী ছাত্রীরা হন সেক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হবে, আয়োজন করা হবে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনাচক্রেরও। এছাড়া আগামী দিনে নেচার ক্লাব বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, যার মূল কুশীলব হবেন বিদ্যার্থীরাই। নেচার ক্লাব আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করেছেন ছাত্রীরাই, শুধুমাত্র সহায়ক ভূমিকা নিয়েছেন নেচার ক্লাবের দুই প্রাথমিক সদস্য। এই বাংলা ই- ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে নেচার ক্লাব কলজের উপাধ্যক্ষ ড. সন্দীপ কুমার ঘটক মহাশয়, আসানসোল গার্লস কলেজের টিচার্স কাউন্সিল-এর সেক্রেটারি ড. সুরজিৎ জানা মহাশয় এবং সহকারী সেক্রেটারি ড.উত্তম কুমার মণ্ডল মহাশয়ের এবং আই কিউ এ সি এর কোঅরডিনেটর ড. বীরু রজক মহাশয় এবং আসানসোল গার্লস কলেজের গণকযন্ত্র বিজ্ঞান এবং প্রায়োগিক গণকযন্ত্র বিজ্ঞান বিভাগ সহ অন্য সকল বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছে।

বিনীত

নেচার ক্লাবের সদস্যগণ

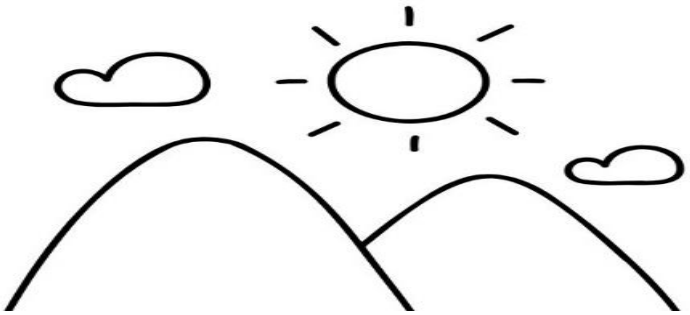

রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা : প্রসঙ্গ রক্তকরবী

সোনালী ভাণ্ডারী

৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোম শহরে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করে। 'Eco- feminism' কথাটি ১৯৭৪ সালে Franoise d' Eaubonne তাঁর 'La feminism on Lamart' গ্রন্থে প্রথম প্রয়োগ করেন । d's Eaubonne প্রাকৃতিক সংকট ও সমাজে নারীদের কমগুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজেছেন। Eco- feminism এর মধ্যে একটা মতবাদ হল cultural Eco- feminism , যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'Domination and Exploitation of Nature' এবং এর সাথে নারীর অবদমিত হবার মধ্যে সম্পর্ক কে দেখানো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় এই সকল বিষয় এসেছে অনেকটা আগেই।সনাতন ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিকে মাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর রবি ঠাকুরের জীবনে ভারতের এই দর্শনের প্রভাব সুবিস্তৃত ।কবিগুরু ইউরোপ ভ্রমণের সূত্রে আধুনিক সভ্যতার ভয়ংকর পরিণতি পরিদর্শন করেছিলেন । তিনি শঙ্কিত ছিলেন আধুনিক সভ্যতা ক্রমে বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ কে বিছিন্ন করছে পরিবেশ থেকে। এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার ক্কথা উঠে আসে রক্তকরবী নাটকে।

রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাংকেতিক নাটক। নাটকটি বাংলা ১৩৩০ সনের শিলং-এর শৈলবাসে রচিত। তখন এর নামকরণ হয়েছিল যক্ষপুরী। ১৩৩১ সনের আশ্বিন মাসে যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তখন এর নাম হয় রক্তকরবী। মানুষের অসীম লোভ কীভাবে জীবনের সব সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্র ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করেছে এবং এর ফলে তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কীরূপ ধারণ করেছে এরই প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকটিতে। "রক্তকরবী"র মূলকথা হল পৃথিবীকে নিষ্প্রাণ, মরুময়, লোভশোষিত করে তোলা নয়, বরং তাকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভূমিতে পরিণত করা। স্নেহ, মায়া, দয়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত আছে সনাতন মানবতাবোধ এবং বৃহৎ অর্থে পরিবেশ সচেতনতা। 'রক্তকরবী' নাটকের নায়িকা নন্দিনী হল সেই মানবতাবোধেরই জলন্ত প্রতীক।

নাটকে বলা হয়েছে যক্ষপুরীর এক অর্থলোভী রাজার কথা । তার সে লোভের আগুনে প্রাণ যায় সোনার খনির শ্রমিকদের যদিও রাজার দৃষ্টিতে খনি শ্রমিকরা মানুষ নয়, তারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র। এভাবেই মানবতা অবমাননায় পতিত হয়েছে । জীবনের প্রকাশ যক্ষপুরীতে নেই। জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণরূপ-প্রেম ও সৌন্দর্য, 'নন্দিনী' চরিত্রটি তার প্রতীক। নন্দিনীর আনন্দস্পর্শ যক্ষপুরীর রাজা পাননি তার লোভের মোহে, সন্ন্যাসী পাননি তার ধর্মসংস্কারের মোহে, মজুররা পাননি অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে, পণ্ডিত পাননি দাসত্বের মোহে। যক্ষপুরীর লোহার জালের বাইরে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক নন্দিনী সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকল; এক মুহূর্তে মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শে যেন সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। রাজা নন্দিনীকে পেতে চাইলেন যেমন করে তিনি সোনা আহরণ করেন, শক্তির বলে কেড়ে নিয়ে। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্যকে এভাবে লাভ করা যায় না। তাই রাজা নন্দিনীকে পেয়েও পাননি। একইভাবে মোড়ল, পণ্ডিত, কিশোর, কেনারাম সবাই প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচার জন্য ব্যাকুল হয়ে জালের বাইরের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে তাই তার মধ্যে প্রেম জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু রঞ্জন যক্ষের বন্ধনে বাঁধা। এ যন্ত্র তার প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল- এটাই যান্ত্রিকতার ধর্ম এবং কবি তা বিশ্বাস করেন। নন্দিনীর প্রেমাস্পদ যান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে নিঃশেষিত হলো এবং আবার যেন প্রেমকে ফিরে পাওয়া যায় সে লক্ষ্যে জীবন জয়ী হলো।রক্তকরবী নাটকের নায়িকা নন্দিনী। লোভময় সমাজ ও বন্ধনময় জীবনের জালকে ছিন্নভিন্ন করে লোহার জঞ্জাল থেকে উঠে আসা এক রক্তকরবীর কথা এই সাহিত্যকর্মের

উপজীব্য। নাটকটির প্রত্যেক ছত্রে-ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এক তুমুল সদর্থক আশাবাদ, ও নৈরাশ্যবাদের বিনাশ। অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবিত হওয়ার এক অকৃত্রিম প্রেরণা মেলে এই নাটকে। 'রক্তকরবী' নাটকে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়েছে এক তুমুল আশাবাদ। এখানে শেষ পর্যন্ত আলোরই জয় হয়, বিনাশ হয় অন্ধকারের। এখানে একটি সুচিন্তিত পরিবেশ সচেতনতার বাণী প্রকাশিত। বিশুর সংলাপেও তা প্রতিধ্বনিত।

মানবতাবাদ তথা পরিবেশবাদের। নাটকের সমাপ্তিতে রক্তকরবী প্রলয়কুসুম হয়ে দেখা দেয়। তার আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রেম ও বিপ্লবের প্রতীক রূপে। যক্ষপুরীর নীচে শ্রমিকদল তালতাল সোনা তোলার কাজে নিযুক্ত। যন্ত্র আর যান্ত্রিকতাই এখানকার বাঁচার একমাত্র রসদ। সেখানে একবালক নির্মল, বিশুদ্ধ, প্রাণজুড়ানো হাওয়া নিয়ে আসে নন্দিনী। সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক কিশোর নন্দিনীতে বহু কষ্ঠে, বহু যত্নে 'রক্তকরবী' এনে দেয়। যা তাকে যক্ষপুরীতে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, কিন্তু এটা জেনেও যে শাসকরা তার এই কার্যের কথা জানলে তাকে নিদারুণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিশোর নন্দিনীকে বলে, "তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।" "রক্তকরবী' হল প্রেমের শুদ্ধতম রূপ। সে ফুল ব্যাথার ফুল। অনেক দুঃখকষ্টের ফসল এই ফুল। নন্দিনীর রক্তকরবীর আভরণ লোভাতুর রাজার মধ্যে প্রকৃতি তথা সৌন্দর্যের বীজ বপন করতে সমর্থ হয়েছে, "তোমাদের ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারি নে কেন?" যক্ষপুরীর অপ্রেম ও অপ্রাণের রাজত্বে রক্তকরবী নিয়ে আসে মুক্তির সতেজ হাওয়া। নন্দিনী ও রঞ্জন হল 'রক্তকরবীর' সঠিক অর্থে সংকেত অর্থের ধারক ও বাহক। রক্তকরবী হল মানবিক প্রকাশের প্রতীক এবং তাকে সার্থক ভাবে বিকশিত করে নন্দিনী নামক এক নারীর স্পর্শ, আত্মসমর্পণ ও আত্মিক শুদ্ধিতা। উজ্জ্বল আলো, সুনির্মল বাতাস, সুনির্মল বারিরাণির দাক্ষিণ্যে যে শুদ্ধ জীবন। তথা পরিবেশ রচিত হয়, তারই অমৃতবার্তা বহন করে 'রক্তকরবী' তথা 'নন্দিনী'। যা জীবনের পূর্ণতারই প্রকাশ। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠকুরের Eco-feminism এর যথার্থতা।

'রক্তকরবী' নাটকের উপসংহারে দেখা যায় যক্ষপুরীর রাজা ফ্যাঙ্কেনস্টাইনের মত নিজেরা সৃষ্ট যন্ত্রদানবকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। 'নন্দিনী রাজার অচলায়তন ভাঙার অঙ্গীকার করে বলেছিল, "আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।"

এর প্রত্যুত্তরে রাজা বলেন,

"আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে ।... আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি।"

রাজা নিজের সৃষ্ট যন্ত্রদানবের সম্পর্কে বলে ওঠেন, "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা।

সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।"

যন্ত্রসভ্যতার বিপরীতে পরিবেশবার্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে 'নন্দিনী' -র তথা আজকের Eco-feminism এর এখানেই সার্থকতা।

মহাত্মা গান্ধীর পরিবেশভাবনা

বর্ণালী মাজি (৪র্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ), **শম্পা মুন্ডা** (৪র্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), **প্রিয়া রায়** (৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯ -১৯৪৪) শুধু মানুষের আর্থিক উন্নয়ন নয়, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তা করেছেন আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে। তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে। এজন্য আজকের পরিবেশবাদীরা গান্ধীজির চিন্তা থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন।

তাঁর আদর্শগ্রাম বিষয়ক ভাবনার নিরিখে এই বিষয়টি দেখা যেতে পারে। ১৯৩৭ সালে আদর্শগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজি নিজের ভাবনার কথা লেখেন, যা এক সাদামাটা গ্রামের কথাই বলে। যাতে থাকবে কুটির , সঙ্গে থাকবে যথেষ্ট আলো, যাতে খেলতে পারে হাওয়া বাতাস। পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে পাওয়া যায় এমন সব উপাদান দিয়ে তৈরি হবে সেগুলো। সামনে থাকবে উঠোন, ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য যেখানে ফলানো হবে শাকসবজি, রাখা হবে গবাদি পশু। ধুলোবালি থেকে মুক্ত রাখা হবে গ্রামের গলি ও রাস্তাগুলো। প্রাথমিক আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেখানে মূল লক্ষ্য হবে বৃত্তিগত শিক্ষাদান। এইভাবে তিনি নির্মল পরিবেশে বাঁচার কথা ভাবতেন। তাঁর সরল জীবনের যে ভাবনা তাঁর মধ্যেও আছে পরিবেশের কাছে , প্রকৃতির কোলে জীবন যাপনের তাগিদ। এর হদিস মিলবে তাঁর আত্মজীবনেতেও । আত্মজীবনীতে গান্ধীজী তার যৌবনে পড়া বইগুলোর মধ্যে স্মরণ করেছেন জন রাস্কিনের আনটু দিস লাস্ট, এর কথা। এটি তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল এক তাৎক্ষণিক ও ফলিত রূপান্তর। আরেকজন হলেন এডোয়ার্ড কার্পেন্টার , তাঁর লেখাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।জন রাস্কিন ও এডোয়ার্ড কার্পেন্টার দুজনের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন ১৯০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই হিন্দ স্বরাজ -এ। শিল্পসমাজ গান্ধী পশ্চিমে দেখেছেন কিছুটা নিজের চোখে, আর কিছুটা জেনেছিলেন রাস্কিন-এর মত লেখকের রচনা পাঠ করে। যে সমাজ আসলে স্বার্থপর, প্রতিযোগী এবং প্রকৃতির প্রবল ক্ষতিসাধক। অন্যপথ হিসেবে গান্ধী প্রস্তাব রেখেছিলেন স্বেচ্ছাপ্রসূত সরলতাময় আচরণবিধি পালনের ওপরে, যা ভোগের চাহিদাকে কমিয়ে রাখবে।গান্ধীর দৃষ্টিতে এই ভারত মানেই গ্রাম ভারত।বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ঝোঁক উপেক্ষা করে তিনি কাজ করতে চেয়েছেন গ্রামগুলির নবরূপায়ণে। তার কারণ ছিল নৈতিক ও বাস্তুসাংস্থানিক।ডিসেম্বর ১৯২৮-এ তিনি লিখেছিলেন যে ঈশ্বর না করুন, পশ্চিমের বাঁচে ভারতে যেন কখনও শিল্পায়ন না হয়। তাঁর দৃষ্টি তে যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা আসলে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতার নামান্তর।

রাস্কিনের মতো গান্ধীও ভেবেছিলেন গ্রামাঞ্চলকে একপেশে ভাবে শোষণ করেই নগর ও কারখানার বিকাশ হতে পারে। জুলাই ১৯৪৬-এ তিনি লিখছেন যে গ্রামগুলোর রক্তই হচ্ছে সেই সিমেন্ট যা দিয়ে শহরের সৌধগুলো গাঁথা হয়। তিনি দেখে যেতে চেয়েছিলেন, যে রক্ত আজ নগরীর ধমনীগুলোকে স্ফীত করে তুলছে তা যেন আবার গ্রামের রক্তবাহী নালি দিয়ে প্রবাহিত হয়। আসলে তিনি ভোগবাদী জীবন বিলাস কে এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন, এটিই তাঁর পরিবেশ ভাবনার মূল দিক বলা চলে। এপ্রসঙ্গে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে আলোচনায় ইতিটানা যেতে পারে,

“The world has enough for everybody’s need, but not enough for one person’s greed”

সহায়ক গ্রন্থ-

RAMCHANDRA GUHA, ENVIRONMENTALISM: A GLOBAL HISTORY, PENGUIN, 2014

সুন্দরলাল বহুগুণা : এক পরিবেশ প্রেমীর কথা

অঙ্কিতা মহান্ত এবং **সীমা মন্ডল**
ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ (সাম্মানিক)

সুন্দরলাল বহুগুণা একজন ভারতীয় বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং চিপকো আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি একটি সাধারণ এবং টেকসই জীবনধারা অনুশীলন করেছিলেন যা অনেককে অনুপ্রাণিত করে যারা এই কারণটিতে প্রচুর অবদান রেখেছিল। সুন্দরলাল বহুগুনা ১৯২৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন পুরোদমে চলছে তখন উত্তরাখণ্ডের একটি পাহাড়ি অঞ্চল তেহরি জেলার মারুদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন তার অঞ্চলের লোকেরা তেহরির রাজার অত্যাচারী শাসনে অসন্তুষ্ট ছিল এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৯৩০ সালের ৩০ মে, রাজা সৈন্যদের নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। অনেকের মৃত্যু হয় এবং তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।তখন বহুগুণার বয়স মাত্র তিন বছর। দশ বছর পর, তিনি তেহরির একই রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৩ বছর বয়সে তার প্রকাশ্য রাজনীতিতে আশার শুরু । তিনি তার বিএ (ব্যাচেলর অফ আর্টস) এর জন্য লাহোর যান এবং তারপরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য বারাণসীতে যান। তবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য পড়ালেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিছুকাল। যে সময়ে তিনি জেলও খেটেছিলেন।

কৈশোরের শুরুতেই সুন্দরলালের উপর প্রভাব বিস্তার করলেন শ্রীদেব সুমন (১৯১৬-১৯৪৪)। যার লড়াই ছিল সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে। শ্রীদেব সুমন কিশোর সুন্দরলালকে বুঝিয়েছিলেন প্রথাগত পড়াশোনার অসারতা সম্পর্কে। রাজদরবারের চাকরির প্রলোভনকে গুরুত্ব না দিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকেই সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত হন সুন্দরলাল বহুগুনা। অস্পৃশ্যতা নামক দুরারোগ্য ব্যাধিটি ভারতীয় সমাজ জীবনকে পীড়িত করে আসছিল বহু শতাব্দী ধরে, প্রথম জীবনে তিনি অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু শ্রীদেব সুমনের নেতৃত্বে অংশ নেন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে। ১৯৪৪-এ রাজার কারাগারে অত্যাচারের বিরোধিতায় আমরণ অনশনে মৃত্যু হয় শ্রীদেব সুমনের। এই ঘটনা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল সুন্দরলালকে।এভাবেই হয়েছিল তাঁর গণআন্দোলনের পথে যাত্রা শুরু।

পাহাড়ি মহিলাদের দুঃখপূর্ণ জীবনকে দেখছিলেন খুব কাছ থেকে। মদ্যপ স্বামীদের অকর্মণ্যতা, অত্যাচারে গ্রামের মহিলাদের জীবন ছিল কষ্টকর। তাই পাহাড়ের গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন তিনি । যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এই আন্দোলনে।এসবের মাঝেই রেল পথের বিস্তার ঘটতে থাকে ভারতে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ১৮৫৩ সালের থেকে রেল-এর পথ চলা শুরু হয় । রেলের স্লিপার আর জ্বালানির কাঠ সংগ্রহের জন্য ধ্বংস করা শুরু হয় হিমালয়ের বনভূমিকে। এছাড়া সাহেবদের জন্য বিলাসবহুল বাংলো, আসবাব ইত্যাদি জন্যেও নজর পড়েছিল হিমালয়ের ওপর। অদৃশ্য হতে থাকে নিবিড় হিমালয়ের বনভূমি। সুন্দরলাল বুঝলেন শিল্প বিপ্লব পরবর্তী পৃথিবী যাকে উন্নয়ন বলে ভাবছে, তা বাস্তবে প্রকৃতি ও পরিবেশের পরিপন্থী। পদব্রজে ৪৭০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সুন্দরলাল দেখেছিলেন মানুষের ভোগবাদী জীবন ও সংস্কৃতি পরিবেশের কতটা ক্ষতিসাধন করছে আর এখানেই তাঁকে প্রভাবিত করে গান্ধীজীর সরল জীবনাদর্শ। সুন্দরলাল অনুভব করলেন সভ্যতার সংকট অনিবার্য। তিনি ঠিক করলেন সারা জীবন ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন আর সঙ্গে হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিণী বিমলাকে। বিমলা ছিলেন মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। এসব এর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এই দম্পতি পার করলেন ১৯৪৭। স্বাধীন হল ভারত।তবে হিমালয়-এর মন ভাল ছিল না । ১৯৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকেই ভারত সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য কাশ্মীর থেকে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সড়ক নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবে হিমালয় অঞ্চলের বৃক্ষচ্ছেদন প্রক্রিয়া অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। সুন্দরলাল বহুগুনা চণ্ডিকাপ্রসাদ ভাটের মতো পরিবেশপ্রেমী মানুষেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বৃক্ষচ্ছেদনের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে থাকেন।

১৯৭৪-এ শুরু হয় বিখ্যাত চিপকো আন্দোলন। হিন্দী 'চিপকো' শব্দের অর্থ জড়িয়ে ধরো, স্থানীয় মানুষরা ঠিকাদারদের হাত থেকে গাছ বাঁচাতে গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেন। কুঠারাঘাত যেন গাছে লাগার আগে গ্রামবাসীদের আহত করে। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অহিংস পদ্ধতিতে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারাবিশ্বের নজর কেড়েছিল। সুন্দরলাল বহুগুনার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল সুদীর্ঘ ৫০০০ কিলোমিটারব্যাপী পরিবেশ সচেতনতার পদযাত্রা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাঁরা সাধারণ

গ্রামবাসীকে সচেতন করতে থাকেন। অহিংস লড়াইয়ের তীব্রতায় বিচলিত উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতীনন্দন বহুগুনা একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন, যার রিপোর্ট গ্রামবাসীদের পক্ষে যায়। ১৯৭৭ সালে ওই অঞ্চলের মহিলারা গাছেদের রাখি বাঁধার অনুষ্ঠান করে। এই আন্দোলন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৭৭ সালের মে মাসে হেনওয়াল উপত্যকায় গাছ কাটা বন্ধ করতে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করলেন তিনি। এই আন্দোলন ও প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেওয়া হল আশপাশের অঞ্চলে এবং পরের বছর তেইশ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন গাছ কাটার বিরোধিতার জন্য কিন্তু লড়াই থামে নি। তিনি প্রথমবার গ্রেপ্তার হলেন ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে। একদিকে চামোলি এবং অন্যদিকে তেহরি-গাড়োয়াল এলাকায় এই আন্দোলন কখনও তীব্র, কখনও স্তিমিত আকারে দেখা গেল আশির দশকের মধ্যভাগ অবধি। কিছুটা হলেও বহুগুনা সরে গিয়েছিলেন আন্দোলনের বৃত্ত থেকে। সেই সময় তিনি তেহরি বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতার কাজেও সময় দিচ্ছেন। ফলে নেতৃত্বের অভাবে ক্ষীণ হয়ে পড়ল আন্দোলন। যদিও বলা হয়, বহুগুনার প্রভাবে সবুজ গাছ কাটার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা গিয়েছিল। ১৯৮০ সালে সুন্দরলাল বহুগুনা ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। এরপরে শ্রীমতী গান্ধি গাড়োয়াল অঞ্চলে পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ করেন।

সুন্দরলাল বহুগুনা তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলনেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন। তিনি সত্যাগ্রহ ও অনশনের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন শাসকের কাছে। ১৯৯৫ সালে তিনি দীর্ঘ ৪৫ দিন ব্যাপী অনশন করেছিলেন।সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এই বাঁধ নির্মাণের বাস্তুতান্ত্রিক প্রভাব অনুসন্ধান করে দেখবেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন। আন্দোলনে অংশ নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তারও হতে হয় (২০ এপ্রিল ২০০১)।

দেশের দক্ষিনে পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম এ বহুগুনার অবদান ততটা আলোচিত ছিল না বহুকাল। তবে তাঁর অনুগামী ছিলেন দক্ষিণেও। দক্ষিনের সঙ্গে যোগের সূত্রপাত সেই দীর্ঘ হিমালয় যাত্রার সময়য়েই। এই পাহাড়পথেই তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন তেইশ বছরের যুবা, কর্ণাটক এর পাণ্ডুরঙ্গ।ভানার রেশ নিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ পৌঁছালেন কর্ণাটক এর উত্তর কোন্নর জেলায়। সেখানে গড়ে ওঠে অ্যাপিক্য আন্দোলন। ১৯৮৩সালে কর্ণাটকের সিরসি অঞ্চলের সালকানি বনাঞ্চলে গাছ কাটার বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন গড়ে ওঠে তা অ্যাপিক্য আন্দোলনের নামে পরিচিত।অ্যাপিক্য শব্দের অর্থ হলো গভীর ভাবে জড়িয়ে থাকা।গ্রামের ১৬০জন নর নারী এবং বাচ্ছা গাছ কে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে ও গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে।এই ভাবে অ্যাপিক্য আন্দোলন শুরু হয়।এই ভাবে অ্যাপিক্য আন্দোলন শুরু হয়।এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পান্ডুরাম হেগড়ে।এর সাথেও সঙ্গত দিয়েছিলেন সুন্দরলাল। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ বিকশিত করেন নূতন ভাবনার। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচানোর কথা উঠে আসে সাধারণের মুখে। এর সুফল পেতে দেরি হয় নি। ১৯৮৯ সালে ঐ এলাকায় গাছ কাটার উপরে বিধি নিষেধ আরোপিত হয়। এই ভাবে দেশের দক্ষিণ অংশেও নিজের আন্দোলন এর ছাপ রেখে গিয়েছেন বহুগুনা।

যদিও দক্ষিণের থেকেও তেহরি বাঁধ এর নির্মাণ আটকাতে সুন্দরলাল বহুগুনার সংগ্রামের কথা অবশ্য ভালো ভাবেই জানে দেশের অধিকাংশ মানুষ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতের অন্য অনেক রাজ্যের মতো উওর প্রদেশ এ বাঁধ এর ভিড় বেড়েছে ধীরে ধীরে। বাঁধের নির্মাণ আটকানো যাই নি সত্যি কিন্তু বহুগুনা তার আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তা অটুট থাকবে বহুযুগ।

উত্তর ভারতের ‘বীজ বাঁচাও’ আন্দোলনের সামনের সারিতে দেখা গেছে সুন্দরলাল বহুগুণাকে। রাষ্ট্র তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে, ১৯৮১তে পদ্মশ্রী, ২০০৯-এ পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। কিন্তু কতটুকু শোনা হয়েছে তাঁর কথা? তিনি এমন একজন মানুষ হিসেবে যার গোটা জীবনটাই ছিলো পরিবেশ রক্ষার বার্তা স্বরূপ। আজও হাটছেন তিনি। পরিবেশ বাঁচতে অবিরাম পদযাত্রার মাঝে ২০২১ সালের ২১ মে তারিখে তার মৃত্যু একটা সামান্য বিশ্রামবিন্দু হয়ে রয়ে যাবে।

মিথেনের কথা

ঋতবীণা মিত্র, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, রসায়ন বিভাগ

মিথেন বেশ অপরিচিত আমাদের কাছে । ১৭৭৬ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে অ্যালসান্দ্রো ভোল্টা নামে এক বিজ্ঞানী (পদার্থবিদ) ইউরোপের ম্যাগিওর হ্রদ থেকে মার্শ গ্যাস সম্পর্কিত অধ্যয়ন করতে গিয়েই এর আবিস্কার করেছিলেন। যার রাসায়নিক সংকেত CH_4. পৃথিবী সৃষ্টির আদি পর্যায়ে মিথেনের মূল উৎস ছিল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু দিন বদলেছে আজ তাঁর পরিবেশে আসার উৎস বেড়েছে আরও। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে তৈরী হয়েছে অসংখ্য শিল্প , এসেছে মোটর যান। যার ফলস্বরুপ বৃদ্ধি পেয়েছে মিথেনের উৎসও । একটি সূত্র মোতাবেক ২০০৭ সালের পর থেকে বায়ুমন্ডলে এই গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার প্রবনতা উর্দ্ধমুখী ও বেশ দৃষ্টিগোচর হয়ে দাঁড়ায়। যদিও বর্তমানে শিল্প, কৃষি ও গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মিথেনের । যেমন জৈব সার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে মিথেন তেমন শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক (যেমন - অ্যাসিলিটন, ফরম্যালডিহাইড) প্রস্তুতির কাঁচামাল হিসেবে মিথেন ব্যবহার করা হচ্ছে আর গৃহস্থালীর কাজে যে বায়োগ্যাস ব্যাবহার করা হয় তাতেও রয়েছে প্রচুর পরিমানে মিথেন। মিথেন কে কম বায়ুতে অসম্পূর্ন দহনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় কার্বন ব্ল্যাক যা রবার, পেইন্ট, ছাপার কালি, জুতার কালি তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মিথেনের উৎসগুলির মধ্যে পেট্রোলিয়াম, খনি, কয়লাখনি, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলাভূমি ইত্যাদি প্রধান ।

এইরুপ ব্যবহার ও উৎসের দরুন বর্তমানে বায়ুমন্ডলে মিথেনের পরিমান দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬.৩ শতাংশ । কিন্তু মিথেনের পরিমান বৃদ্ধি পরিবেশের জন্য একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয় । মিথেন শুধুমাত্র একটি ক্ষতিকর বায়ুদূষকই নয়, এটি একটি অন্যতম প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাসও । বায়ুতে মিথেনের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে শ্বাসক্রিয়ার সময় মিথেন অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে, ফলে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

এবার গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে মিথেনের ক্ষতিকারক দিকটি দেখা যাক । শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত তাপমাত্রা প্রদানের জন্য একপ্রকার কাঁচের ঘর ব্যাবহার করা হয় যা গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত । এই গ্রিনহাউস সূর্য থেকে আগত রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু ভিতর থেকে প্রতিফলিত রশ্মি বাইরে যেতে দেয় না, যার ফলে ভেতরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকার অনুকূল হয় । বায়ুমন্ডলে মিথেন ঠিক এইরুপ ভূমিকাই পালন করে । মিথেনের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশী । বিজ্ঞানীদের মতে, কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় মিথেন গ্যাস বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা এক শতাব্দী কাল সময়ব্যাপী ৩০ গুন বেশী ধরে রাখে । ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যরশ্মি এসে পৌছাবার পর যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যেতে চায়, তখন বায়ুমন্ডলে উপস্থিত মিথেন গ্যাস তা শোষন করে নেয় এবং তাকে পুনরায় মহাশূন্যে ফিরে যেতে দেয় না। ক্রমাগত এইরুপ তাপশোষনের ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গ্রিনহাউস গ্যাস এফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামে পরিচিত । তাই বায়ুমন্ডলে মিথেনের ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাপমাত্রাও। যার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রানীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ, বিপন্ন হচ্ছে রেইনডিয়ার জাতীয় প্রানী, মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, বাড়ছে জলস্তর, নিমজ্জিত হচ্ছে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল, বিজ্ঞানীদের মতে মিথেনের ঘনত্ব এইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে যার ফলে ব্যহত হবে উদ্ভিদ ও প্রানীর শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, এমনকি বিলুপ্তও হতে পারে কিছু কিছু প্রজাতি।

সুতরাং সমগ্র জীবজগৎ ও পরিবেশকে এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এখন থেকেই নিয়ন্ত্রন করতে হবে মিথেনের পরিমানকে, শিল্প ক্ষেত্রে মিথেনের পরিমান কমাতে হবে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই বায়ুমন্ডলে মিথেনের নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত সম্মেলন আয়োজন করেছেন এবং তাতে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার একটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যা ধরে রাখার জন্য অবশ্যই মিথেনের পরিমান বায়ুমন্ডলে সহনসীমার মধ্যে রাখা দরকার। সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় মিথেনের ক্ষতিকরদিক থেকে পরিবেশ ও জীবজগতকে রক্ষা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথা

ঋত্বিকা কুন্ডু, চতুর্থ সেমিস্টার, প্রায়োগিক গণকযন্ত্র বিভাগ (বি সি এ)

ইলেট্রনিক বা বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি অকেজো হলে তাঁর কিছু অংশকে বা গোটা যন্ত্রই আমরা যত্র তত্র ফেলে দিই, আর এগুলিই ই-বর্জ্য নামে পরিচিত। বৈদ্যুতিন শিল্প ভারতের মত উন্নয়নশীল সমাজের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করলেও তা বয়ে আনছে ই-ওয়েস্ট বা ই-বর্জ্য এর সমস্যাকেও।

বৈদ্যুতিন বর্জ্য মেরামত, পুনঃব্যবহার এক্ষেত্রে একটা সমাধান হতে পারে, যেহেতু যত্র তত্র ই-বর্জ্য ফেললে তা পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে স্মার্টফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ব্যাটারি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক ইত্যাদি। এগুলিতে থাকে এমন কিছু উপাদান যা সরাসরি জলে ফেলে দিলে বা মাটিতে ফেলে রাখলে মাটির যেমন ক্ষতি হতে পারে, তেমন কমতে পারে উর্বরা শক্তি। তেমনই এগুলিকে জলে ফেলা হলে,তা জল কে করতে পারে দূষিত। গত শতকে তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি ভারতীয়,বিশেষ করে শহুরে মানুষের জীবনীশৈলিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর অব্যবস্থাপনার দরুন গজিয়ে উঠেছে দূষণের নতুন নতুন সমস্যা। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পার্সোনাল কম্পিউটার -এর কথা তুলে ধরা যায়। এই কম্পিউটারে কিছু মারাত্মক বিষাক্ত যন্ত্রাংশ থাকে। ক্লোরিনায়িত এবং ব্রোমিনায়িত পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস, বিষাক্ত ধাতু, অ্যাসিড, প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক অ্যাডিটিভ যেগুলি পরিবেশ ও স্বাস্থ্য-এর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বিশ্বের পার্সোনাল কম্পিউটারের বিক্রি বেড়ে চলায় এবং এই কম্পিউটারের গড় আয়ু দ্রুত কমতে থাকায়, বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পাহাড় জমছে। আর যার উপর জমছে সেই মাটিও হচ্ছে দূষিত। ১৯৯৭ সালে কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) কাজ চালাতো ৪ থেকে ৬ বছর। ২০০৫ সালে তার আয়ু কমে হয়েছে ২ বছর মাত্র। ফলে ফেলে দেওয়া ই-বর্জ্য এর পরিমান বাড়ছেই। অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জাম-এর ব্যবহার এবং উৎপাদন দুইই বেড়েছে। ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত মানের উচ্চ প্রযুক্তির সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার তৈরির কিছু সুযোগ-সুবিধে থাকে কিন্তু এখানে ই-বর্জ্য এর পুনঃব্যবহারযোগ্য করার ক্ষেত্র এখনও তেমন সুবিধাজনক নয়। কম্পিউটার, মনিটর এবং টেলিভিশন ইত্যাদি জিনিসগুলি মাটিতে পুঁতে ফেললে এবং জমি ভরাট করার কাজে লাগালে এবং পুড়িয়ে দিলে তাতে আমাদেরই বিপদ বাড়ে, যেহেতু এসবে রয়েছে বিপজ্জনক উপাদান। বৈদ্যুতিন জঞ্জাল ঠিকমত দূর না করলে ক্ষতি হয় পরিবেশেরও। গত দশক থেকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প হয়ে উঠেছে অর্থনীতির এক বড়ো চালিকাশক্তি। ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত দ্য গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট মনিটর, ২০১৭-এর একটি হিসেব দিয়েছিল। এতে ভারতে ফি বছর ২০ লক্ষ টন-এর বৈদ্যুতিন জঞ্জাল তৈরি হয় এমনটাই বলা হয়েছিল যার প্রায় ৮২ শতাংশ ব্যক্তিগত ব্যবহারের যন্ত্রপাতি।বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের অধিকাংশ উপাদানে আছে ক্যাডমিয়াম, পারা, পলিভিনাইল ক্লোরাইড(PVC), ক্রোমিয়াম, বেরীলিয়াম ইত্যাদি। টিভি, ভিডিও এবং কম্পিউটারে ক্যাথোড রে টিউব (CRT) ব্যবহার হয়। এই টিউবে প্রচুর সিসে থাকে এবং উন্মুক্ত সিসার সামনে বহু সময় অরক্ষিত অবস্থায় থাকলে বৃক্ক, হাড় ও স্নায়ু ব্যবস্থা, প্রজনন এবং থাইরয়েড ও অ্যাড্রেনাল-এর মতো এনড্রোক্রাইম ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্যের জন্য বাতাসে দূষণ ঘটে।বৈদ্যুতিন জিনিসের সিসা,বেরিয়াম, পারা, লিথিয়াম- এর মতো ভারী ধাতু ঠিকমতো অপসারণ না করলে সেগুলি মাটির ছিদ্র দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ জলে মিশে যায় এবং সেই জল নদীনালা বা পুকুর দিয়ে মাটির উপর উঠে আসে। মানুষকে অনেক সময় ভূ - গর্ভস্থ জল বা নদীনালা ও পুকুরের উপর নির্ভর করতে হয়, সেই কারণে তারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। কম্পিউটারের মাদারবোর্ড - এ থাকে চড়া মাত্রায় পারা এবং তা ঠিকমতো দূর না করলে চামড়া ও শ্বাস রোগ ছড়াতে পারে। সিসা-দূষিত জল খেলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মগজের যথাযথ বিকাশ হয় না। শ্রবণ ক্ষমতা কমে, দেহের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পায়। কিন্তু কম্পিউটারের ব্যবহার ছাড়া আমরা চলব কি করে? তাই অব্যবহৃত অংশ কে আমাদের ফেলতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে, দরকার হলে সাহায্য নিতে হবে স্থানীয় প্রশাসনের। এর সাথে সাথে বৈদ্যুতিক বর্জ্য সঠিক অপসারণের পথ হল এর উৎপত্তি একেবারে কমিয়ে ফেলা। কম বিষাক্ত ধাতু বা রাসায়নিক, সহজে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উপাদান ব্যবহারে জোর দেওয়া উচিত।বৈদ্যুতিন বর্জ্য কমানোর আর এক উপায় হচ্ছে ফেলে দেওয়া উপাদান ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। উন্নত দুনিয়া থেকে বৈদ্যুতিন বর্জ্য বা নিম্ন মানের বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির আমাদের দেশে ঢালাও আমদানি বন্ধ করতে প্রচলিত আইনি কাঠামোর ফাঁকগুলিও বন্ধ করা জরুরি। পণ্য উৎপাদকদের অবশ্যই তাদের জিনিসের জন্য আর্থিক এবং আইনগতভাবে দায়ী করতে হবে। গ্রিন হাউস নির্গমন বিশ্ব উষ্ণায়নের এক বড়ো কারণ। এই কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ফেলা ছাড়াও, বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করলে কাঁচামাল থেকে নতুন জিনিস তৈরির সূত্রে জল এবং বায়ুদূষণও কমে। ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুসারে, ২০১৭-১৮ সালে ৬৯,৪১৪ টন বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহ, ভেঙে ফেলা এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। সব শেষে বলা জরুরি ভারতের ই-বর্জ্যের মাত্র ১.৫ শতাংশই আবার ব্যবহার যোগ্য করা হয়ে ওঠে। এর পরিমান যত বাড়বে ততই সুরক্ষিত হবে আমাদের দেশের সবুজ ভবিষ্যৎ ।

ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন প্রোজেক্ট-এর কথা

ঐস্মিতা ঘোষ, ঈশা দত্ত, গোলাপ মাজি, অষ্টমী গরাই, প্রীতি সেন (৪র্থ সেমিস্টার, গণিত বিভাগ)

আজকাল আমরা ইলেক্ট্রিক স্কুটার চড়ি অনেকেই, এতে দূষণ কম হয় বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পরিমান কার্বন এই গ্রহে জমা হচ্ছে তা আদতে দূষণকে আরও বিকশিতই করছে। তাই পৃথিবীর স্বার্থে বিদ্যুতকে ডি-কার্বনাইজ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যুৎ কার্বন নির্গমনের একটি প্রধান উৎস। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে দূষণ হয় তা কমালে বাস্তবে তা পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে ওঠার পথ কেও রোধ করবে। গ্রিন হাইড্রোজেন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত সরকার এব্যাপারে একটি প্রকল্প নিয়েছেন। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে ৫০ লক্ষ টন গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন হবে। এমনটাই লক্ষ্য সরকারের। এই নীতি দেশে পূনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ডেভলপমেন্টে সহায়তা করবে। এক বিবৃতিতে এমনটা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক। প্রস্তাবিত নীতির অধীনে, সরকার ৩০ জুন ২০২৫-এর আগে স্থাপিত হাইড্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া প্রস্তুতকারকদের ২৫ বছরের জন্য আন্তঃরাজ্য ট্রান্সমিশন চার্জ মুকুবের ঘোষণা করেছে। নীতির বাস্তবায়ন হলে আমজনতা সবুজ জ্বালানি ও বিদ্যুতের নাগাল পাবে। সেই সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে। ফলস্বরূপ অপরিশোধিত তেল আমদানিও কমবে। অন্যদিকে হাইড্রোজেন এবং অ্যামোনিয়ার রপ্তানি কেন্দ্র হিসাবেও বিশ্বে শীর্ষ স্থান পেতে পারে ভারত। এছাড়াও এরফলে কি লাভ পেতে পারি আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে?

১. প্রায় ১২৫ গিগাওয়াট এর সাথে সম্পর্কিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা সংযোজন সহ বার্ষিক কমপক্ষে ৫ এমএমটি (মিলিয়ন মেট্রিক টন) সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ।
২. মোট বিনিয়োগ আট লাখ কোটি টাকা ।
৩. লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ।

এবার আসা যাক কিভাবে তৈরি হয় এই বিদ্যুৎ সেই কাহিনিতে। এক্ষেত্রে আসা যাক জল তড়িৎ বিশ্লেষণ এর কথায়। সবুজ হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রলাইসিস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে উৎপাদিত হয় যা জলের অণুগুলিকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিভক্ত করে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।ইলেক্ট্রোলাইসিস প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি ধাপে বিভক্ত করা যেতে পারে: ১.ইলেক্ট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন কোনো অশুদ্ধি অপসারণের জন্য প্রথমে জলকে বিশুদ্ধ করা হয়। ২.বিশুদ্ধ জল তারপর একটি ইলেকট্রলাইসিসের মধ্যে যোগ করা হয়, যাতে একটি অ্যানোড এবং একটি ইলেকট্রলাইট দ্বারা পৃথক করা ক্যাথোড থাকে। নবীকরনযোগ্য বিদ্যুত তারপর কোষের মধ্য দিয়ে যায়, যা জলের অণুগুলির কারণ হয় অ্যানোডে ইলেকট্রন হারাতে এবং অক্সিজেন গ্যাস গঠন করে। একই সময়ে, জল ক্যাথোডের অণুগুলি ইলেকট্রন লাভ করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস গঠন করে। ৩.ইলেক্ট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করা হয় এবং সংকুচিত করা যায় স্টোরেজ এবং পরিবহনের জন্য। এছাড়া থার্মোডাইনামিক্যাল ওয়াটার স্প্লিটিং হল হাইড্রোজেন তৈরি করার একটি পদ্ধতি যা উচ্চ তাপমাত্রার রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করার জন্য সৌর বা ভূ-তাপীয় শক্তির মতো নবায়নযোগ্য উৎস থেকে তাপ ব্যবহার করা হয় ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

জ্বালানী হিসাবে হাইড্রোজেন এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে, যেহেতু হাইড্রোজেন প্রকৃতির সবচেয়ে সুলভ উপাদান ও হাইড্রোজেন হল অত্যন্ত বিশুদ্ধ অণু এবং হাইড্রোজেন শুধুমাত্র অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণে বিদ্যমান (যেমন- জল)। জ্বালানী হিসাবে হাইড্রোজেন, ইলেক্ট্রোলাইসার নামক একটি যন্ত্র ব্যবহার করে ইলেক্ট্রোলাইসিস নামক একটি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল বিভক্ত করে গঠিত হয়।

বেশ কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানি সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদনের পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, রিলায়েন্স গোষ্ঠী সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন করার জন্য একটি মেগা ইলেকট্রলাইজার সুবিধা তৈরি করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন দেশে একটি সবুজ হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। প্রচুর নবায়নযোগ্য শক্তির সম্পদের কারণে ভারতের সবুজ হাইড্রোজেনের একটি প্রধান উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী হওয়ার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের জাতীয় হাইড্রোজেন মিশন এবং সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানির পরিকল্পনা ইঙ্গিত দেয় যে দেশটি হাইড্রোজেন অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ভূমিকম্পের কথা

মধুরিমা ব্যানার্জী, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ

মঙ্গলবার অর্থাৎ ২১.০৩.২৩ তারিখ রাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল দিল্লি, দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ধরে, সঙ্গে ছিল একের পর এক আফটারশক। কেবলমাত্র দিল্লিই নয়, কম্পন অনুভূত হয়েছিল হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানাতেও। National Centre for Seismology-র তরফে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই জোরাল ভূমিকম্পের উৎসস্থল আফগানিস্তানের (Afghanistan Earthquake) কালাফগান অঞ্চলের ৯০ কিলোমিটার এবং ফইজাবাদের থেকে ১৩৩ কিলোমিটার দূরে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৭। ভূমিকম্প বুঝিয়ে দেয় প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা অসহায়। এই সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের মনে করাবে কিছুকাল আগের তুরস্কের ভূমিকম্পের কথা, যার তীব্রতা ছিল আরও বেশি। কেন হয় ভূমিকম্প? ভূমিকম্প এর উৎস বোঝার জন্যে জরুরী পাত সঞ্চালন তত্ত্বকে বোঝার। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় টেকটনিক প্লেট এর কথা। টেকটোনিক প্লেট হল পৃথিবীর ভূত্বকের বিশাল টুকরো এবং উপরের আবরণ। এগুলি মহাসাগরীয় ভূত্বক এবং মহাদেশীয় ভূত্বক দ্বারা গঠিত। এবার আসা যাক প্লেট টেকটোনিক থিওরির বিষয়ে। প্লেট টেকটোনিক্স হল একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা ব্যাখ্যা করে যে কিভাবে পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ গতিবিধির ফলে প্রধান ভূমি ফর্মগুলি তৈরি হয়। পর্বত নির্মাণের ঘটনা, আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প সহ অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করে তত্ত্বটি। এই ধারণা ১৯৬০ সালে সুদৃঢ় হয়। ভূমিকম্প হল পৃথিবীর ভূত্বকের আকস্মিক নড়াচড়া, ফল্ট লাইন বরাবর ঘটে, পৃথিবীর ভূত্বকের ফাটল যেখানে টেকটোনিক প্লেট মিলিত হয়। যা পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ারে হঠাৎ শক্তির মুক্তির ফলে যা সিসমিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে।এটি এতটাই দুর্বল হতে পারে যে অনুভব করা যায় না, কিন্তু সবল হলেই হতে পারে বিপর্যয়। আসা যাক নিকট অতীতের কয়েকটি ঘটনার কথায়। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ভূমিকম্পগুলির মধ্যে তুরস্ক এবং সিরিয়া ভূমিকম্প এর কথা বলা চলে(৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩)। এছাড়াও জাপান ভূমিকম্প এবং সুনামি (১১ ই মার্চ ২০১১) ও হাইতি ভূমিকম্প (১২ই জানুয়ারী ২০১০)-এর কথা বলা চলে। বিগত কিছুদিন ধরে তুর্কিস্থান এবং সিরিয়ায় বারংবার বিধ্বংসী ভূমিকম্প দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে একটি ভূমিকম্প দক্ষিণ ও মধ্য তুরস্ক তে আঘাত হেনেছিল। এর উপকেন্দ্র ছিল গাঙ্গিয়ানটেপ থেকে ৩২ কিমি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে। ভূমিকম্পের মার্কালি তীব্রতা ছিল যথেষ্ট এবং এর ফলে ৫ মার্চ ২০২৩ অবধি ৫২৭০০ জন-এর বেশি মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। এন্টিওক ভূমিকম্পের পর এটি তুর্কির সবথেকে মারাত্বক ও বিধ্বংসী ভূমিকম্প। এর সাথে সম্ভবত ১৮২২ সালের আলেপ্পো ভূমিকম্পেরও তূলনা হয় না ক্ষতির নিরিখে। সিসমোলজিস্টরা তুরস্ককে টেকটোনিকভাবে সক্রিয় এলাকা বলে মনে করেন, সেখানে তিনটি টেকটোনিক প্লেট - আনাতোলিয়া, আরব এবং আফ্রিকা প্লেট একে অপরের স্পর্শ করে যা বিপত্তির হেতু হয় বারবার। এটিকে ঘিরে থাকে দুটি প্রধান চ্যুতি লাইন। উত্তর আনতলিয়ান চ্যুতি এবং পূর্ব অনতলিয়ান চ্যুতি যার স্লিপ রেট প্রতি বছর ৬ থেকে ১০ মিলিমিটারের মধ্যে বিদ্যমান। এই ঘটনা ধীরে ধীরে দেশটিকে পশ্চিমদিকে ভূমধ্যসাগরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এসব তো গেল প্রকৃতির খেয়ালের কথা, কিন্তু কৃত্রিমভাবে ভূমিকম্প কি সম্ভব? একটু অদ্ভুত মনে হলেও অন্তত দুটি উপায়ে মানুষ ভূমিকম্প ঘটাতে পারে। বলা চলে হাইড্রোলিক ফ্র্যাকচারের কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্পের রিপোর্ট অত্যন্ত বিরল। আবার একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ একটি ভূমিকম্প সৃষ্টি করত পারে। তবে সব বিস্ফোরণই ভূমিকম্প সৃষ্টি করে না।

এসবের সূত্রে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের মাথায় অবশ্যই আসে তা হল, আমরা কি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারি? আসলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সঠিকভাবে আমরা দিতে পারিনা এখনো। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা ভবিষ্যতে ভূমিকম্প কোথায় ঘটবে সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। ভবিষ্যতেও যে ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বর্তমানে কয়েকটি উপায়ে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কিছুটা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। যেমন পশুপাখিদের আচরণ লক্ষ্য করেও আমরা অনেকসময় ভূমিকম্পের সম্ভবনা সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকি। যেকোনো প্রাকৃতিক বিপদের পূর্বে পশুপাখিরা অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে। তাদের এই আচরণগত অস্বাভাবিকতা দেখেও ভূমিকম্প বা অন্যকোনো প্রাকৃতিক ক্ষতির ভবিষ্যতবাণী করা যায়। এছাড়া NISAR (Nasa Isro synthetic Aperture Radar) এক্ষেত্রে সহায়ক। এটি হল নাসার দ্বারা নির্মিত ও উৎক্ষেপিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যা ভূমিকম্পের সম্ভবনা সম্পর্কে সংবাদ প্রদানে সক্ষম। এছাড়াও এটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্রবাহ, হিমবাহ,ভূমিধস, ভৌমজলস্তর বনভূমি ও কৃমিজমি এলাকা প্রভৃতি নির্ণয়েও সক্ষম।

ভুমিকম্প কে আমরা বন্ধ করতে পারব না কিন্তু আমরা ভূমিকম্প প্রতিরোধক বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে ভূমিকম্প-এর জন্যে হওয়া ক্ষতিকে কমাতে পারি এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমেও ভূমিকম্পহেতু ক্ষতিকে কমানো সম্ভব। আরও জানতে দুইটি ওয়েবসাইট গুলি দেখা যেতে পারে-• earthquake.usgs.gov. এবং Seismo.gov.in

মানুষ ও পরিবেশ : অন্তরঙ্গতার কথা

ছবি ও লেখায় : **তুহিনা ধীবর**, ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস (সাম্মানিক)

মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে সভ্যতার ঊষালগ্ন-তে বিকশিত হয়েছিল অরণ্য-এর স্নিগ্ধ রমনীয়তা। বৃক্ষলতা শোভিত প্রকৃতির স্নেহনীড়ে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন কালে মানুষ যখন প্রকৃতির অতিঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করতো, তখন প্রকৃতিই তাকে জীবনের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যের জোগান দিয়ে তার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাকে বিকশিত করতে সহায়তা করেছিল। তাই অরন্য ও বনাঞ্চলের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছিল আদিকাল থেকেই।

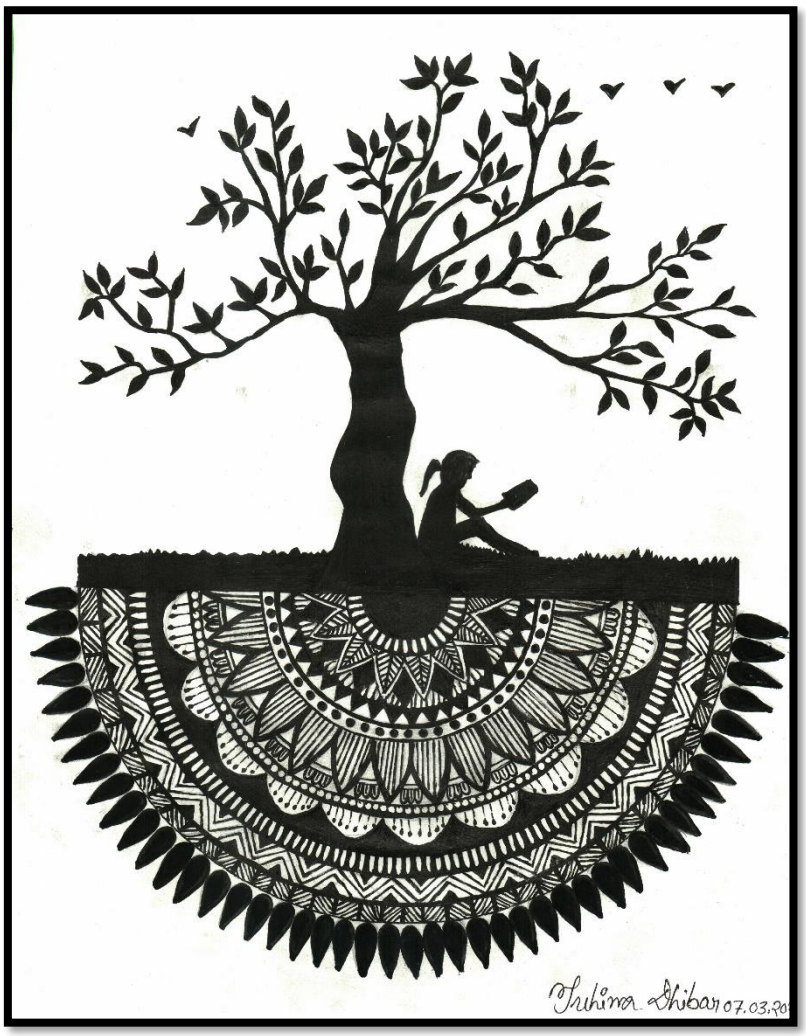

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে চিরযাত্রী মানুষ যুগ থেকে যুগান্তরের পরে যাত্রা শুরু করে অবশেষে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে । নতুন যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশে মানুষ যে নির্বিশেষে বনবিনাশ করছে, তা শুধু সৌন্দর্য বিনাশই নয়,তা মানব সভ্যতার জন্যেও নেতিবাচক। দীর্ঘ উন্নত বৃক্ষরাজি, গভীর অরন্য পরিবেশের ভারসাম্য যেমন রক্ষা করে তেমন একটি অঞ্চলের বৃষ্টিপাতকেও নিয়ন্ত্রিত করেথাকে। নির্বিচারে বৃক্ষছেদন-এর সূত্রে সেই বৃষ্টিপাতই অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, যার স্বাভাবিক ফল হিসেবে কোন অঞ্চলের আবহাওয়ায় একদিকে যেমন উত্তাপ বৃদ্ধিপায় তেমনি অন্যদিকে সবুজ মরুভুমির রুক্ষতায় বিলীন হয়ে যায়। তাই অরন্য ও বনভূমির এই সর্বাত্মক উপযোগিতার কথা মনে রেখই বন সংরক্ষন ও বৃক্ষরোপনের তাৎপর্যটি আমাদের নতুন করে অনুভব ও উপলব্ধি করতে হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে জ্বালানির প্রয়োজনে নাগরিক সভ্যতার বিকাশে প্রতি বছর বহুল পরিমানে বৃক্ষছেদন ও অরন্যভূমির বিনাশ ঘটেছে। এটি অদূর ভবিষত্যে মানবজাতিকে প্রভূত বিপর্যয়ের সম্মূখীন করবে। তাই বৃক্ষরোপন, বনসংরক্ষন এর মাধ্যমে আমাদের প্রকৃতির কাছে আবার নতজানু হওয়া জরুরি।

প্রকৃতি প্রেম

প্রকৃতির কাছে মুগ্ধ আমি শীতল বাতাস দিতে ,

প্রকৃতি তো গড়ে দিয়েছে বিধাতার আদেশে ..

নদীর পাশে, খোলা মাঠে , গাছের নীচে ,

নিঃশ্বাসে সুগন্ধির ঘ্রান নাকের মধ্যে আসে ..

প্রকৃতির প্রেমে পাগল আমি , আলো বাতাস প্রতিনিয়ত খুঁজি..

কবিতা লেখার জন্য আমি দেশান্তরে ছুটি ,

পদ্মা নদীর মাঝে অবাক হয়ে দেখি কত গল্পের মাঝে সেই নদী ..

বৈচিত্র্য ময় প্রকৃতি হঠাৎ মুহূর্ত বদলায় ,

সেটা দেখার প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকি ..

প্রকৃতির প্রেমে দিশেহারা আমি প্রকৃতিকে আগলে রাখি মনে ।।

প্রকৃতির একরূপতা

এক বৈশাখ থেকে ,

আর এক শ্রাবন,

এটাই তো সেই

জীবনের মাপ ..

মাটি নির্মান পাথর খোদাই ,

রাশি রাশি সব রং তুলি খেলা ,

এতেই স্মরন এতেই পূজা..

সারা হয়ে যায় বরনে ।

কলমে -সুদেষ্ণা বকসী, ৪র্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

সবুজ রক্ষায় আসানসোল গার্লস কলেজের এন এস এস এর উদ্যোগ

বিশাখা সিংহা, এন এস এস সদস্য

আসানসোল গার্লস কলেজের এন.এস.এস তথা জাতীয় সেবা প্রকল্প এর স্বেচ্ছাসেবিকারা বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কর্মকাণ্ড-এর সাথে জড়িত। তাঁদের বহু কার্যক্রমের মধ্যে একটি হল প্রকৃতি পরিচর্যা এবং এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা। কলেজ সীমানার মধ্যেকার গাছপালার পরিচর্যা এক্ষেত্রে অন্যতম বিষয়। শীতকাল ও গরমকালে গাছগুলির পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কলেজের মধ্যে একধিক বড় গাছ আছে। এগুলির যত্ন নেওয়ার সাথে সাথে নূতন করে চারা গাছও লাগানোর কাজ করে এন এস এস। সেই চারা গাছ গুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে ব্যাপারে এন এস এস এর স্বেচ্ছাসেবিকারা ততপর থাকেন। দুই এন এস এস পরিচালক তথা শিক্ষক ড.বিনায়ক মিশ্র এবং শ্রী জীবন টুডু মহাশয় বিদ্যার্থীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কলেজের ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রতি বছর গাছ লাগানো, কলেজের নিকটবর্তী নির্বাচিত জায়গায় ক্যাম্পের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার প্রচার এর কাজও পরিচালিত হয় এন এস এস এর দ্বারা। এন এন এস-এর দ্বারা কলেজের গাছ পরিচর্যা বিষয়ক একটি ছবি এক্ষেত্রে দেওয়া হল।

ঋণ স্বিকারঃ ছবি ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন দুই এন এস এস পরিচালক ড.বিনায়ক মিশ্র এবং শ্রী জীবন টুডু